যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

রাত পেরোলেই ‘স্বাধীনতা’র বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হবে। বিভিন্ন জায়গায় নেতা-মন্ত্রীরা আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেবেন সাধারণ মানুষের সামনে। আগের বছরগুলোর মতো এবারও তাঁরা কাগজে লিখে রাখা কিংবা মুখস্থ করা বুলি আওড়ে জানাবেন স্বাধীনতার ইতিহাস (সঠিক জানেন কি না, সেটা জানা নেই)। নেতা-মন্ত্রীর সেই বক্তৃতা শুনে সাধারণ মানুষ কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি আরেকবার নিজেকে ঝালিয়ে নেবে, যে স্বাধীনতা তাঁরা আশা করেছিলেন, তা কি পেয়েছেন? ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকলেও... জানেন উত্তর মিলবে না।

ফোটো: **সৌম্যকান্তি মণ্ডল** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

আমার চোখে কলকাতা

তথাগত রায় (রাজ্যপাল, ত্রিপুরা)

আমার শিরায় শিরায় রয়েছে কলকাতার নাম। এই শহরের সঙ্গে সম্পর্কটা শুরু হয়েছিল সেই ছোটবেলা থেকে। মাঝে মাঝে একবার-দু’বার এদিক-ওদিক গেলেও বেশিরভাগ সময়টা কেটেছে কলকাতায়। তবে কাজের সূত্রে বর্তমানে আমি আগরতলায় থাকি। সত্যি কথা বলতে কী, কলকাতার অভাব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। কিন্তু যে কলকাতাকে আমি চিনতাম সেই কলকাতা আজ আর নেই। শহরের এই সময়ে যা অবস্থা তা দেখে খুব খারাপ লাগে। ক্রমশ কলকাতা অবতরণের পথে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কলকাতাকে এক কথায় ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, কলকাতা বেকারদের শহর, হকারদের শহর ও বৃদ্ধদের শহর।

সেই চল্লিশের দশকের শেষের দিক থেকে কলকাতাকে দেখছি। এখন প্রতি মূহূর্তে মনে হয় কলকাতার শুধু অবনতি হচ্ছে, আর কিছুই নয়। কলকাতা একদম তলায় নেমে গেছে। এই অবস্থা আরও নীচে নামবে কি না, জানি না। এই শহর বর্তমানে একটি বৃদ্ধাবাসে পরিণত হয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির কাছে এটি একটি মারাত্মক সমস্যা। বেশিরভার পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই এখন কাজের সূত্রে বাইরে। দুবাই, পুনে, গুজরাত, মুম্বই, রাজস্থান ছাড়াও বিদেশে যেমন জার্মানি, ইংল্যান্ড—প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাজের জন্যই তাঁরা কলকাতার বাইরে। বর্তমানে কর্ম পরিস্থিতির যা অবস্থা, তাতে দিন-দিন বেকারের সমস্যা বাড়ছে। কর্মসংস্থানের উলটো চিত্রই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। তবে এই অবক্ষয় বা অবতরণ একদিনে শুরু হয়নি। এই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল ১ জুলাই ১৯৬২ যেদিন বিধানচন্দ্র রায় মারা যান তারপর থেকেই। সেদিনের পর থেকে কলকাতা আর ভালো কিছুর মুখ দেখেনি। নকশাল আন্দোলন, ঘেরাও, ৫৬ হাজার কারখানা বন্ধ হওয়া, এক কোটির ওপর মানুষ বেকার—এইগুলি আমরা দেখে আসছি এতদিন ধরে। এই অবস্থার প্রভাব পড়েছে সমাজে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশাল বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি একটি ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসে আছেন।

এরপর তিনের পাতায়

ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

একবেলার খাবার জোটার দিন

সৌরভ মণ্ডল

প্রত্যেকটা দিন শুরুরই একটা গল্প থাকে। অন্য দিনগুলো যেমনই হোক না কেন অন্তত ছুটির দিনগুলো, আমাদের মতো রোজ অফিস আর বাড়ি ছুটে বেড়ানো লোকগুলো তাড়িয়ে তড়িয়ে উপভোগ করে। রোজ ট্রেনে-বাসে যে অসম্ভব যুদ্ধ করতে হয় তা থেকে তো একটা দিনের জন্য হলেও মুক্তি মেলে। তাই কী কারণে ছুটি কেন ছুটি অতশত নিয়ে মাথা ঘামানোর চাইতে ছুটি উপভোগ করাটাই শেষ কথা। আমাদের প্রাইভেট সেক্টরগুলোতে এমনিতেই ছুটি মানে একটা অদ্ভুত বস্তু যার দেখা-সাক্ষাৎ কমই পাওয়া যায়।

সেইদিনটা ছিল পনেরোই আগস্ট, একটা ছুটির দিন। আর পাঁচটা ছুটির দিনের থেকে এটা একটু আলাদাই বটে, কারণ চারিদিকে এত অনুষ্ঠান, মাইক বাজছে, শোরগোল পরিবেশটাই অন্যরকম। সেদিন আমার মেয়ের একটা নাচের প্রোগ্রাম ছিল। অনুষ্ঠান যেখানে, সেটা বাড়ি থেকে বাসে তাও প্রায় ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। মেয়েকে নিয়ে যাবার দায় আমার ওপর পড়ল। সাজগোজ করতে করতে মেয়ে এত সময় লাগাল অনুষ্ঠান শুরু হতে তখন ঘণ্টাখানেক বাকি। বেরোতে বেরতে দেরি হয়ে যাওয়ায় একটা ট্যাক্সি নিলাম। টাইমে তো পৌঁছতে হবে। ট্যাক্সি চলছে। আমি বসে মেয়ের সাথে আলোচনা করছি মেয়ের নাচের পারফরমেন্স নিয়ে, কস্টিউম নিয়ে। ট্যাক্সি ছুটছে। সারা শহর তখন উৎসবমুখর চারিদিকে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন বলে কথা।

হাজরা মোড়ের কাছে ট্যাক্সিটা সিগন্যালে দাঁড়াল। আমি গাড়ির ভেতরে বেজে চলা গানের তালে হালকা হালকা মাথা দোলাচ্ছি। হঠাৎ গাড়ির কাচে ঠকঠক আওয়াজ শুনে বাইরে তাকালাম। দুটো মলিন ছেঁড়া জামাকাপড় পরা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের হাতে একগুচ্ছ ছোট ছোট ভারতের পতাকা। আমি জানালার কাচ

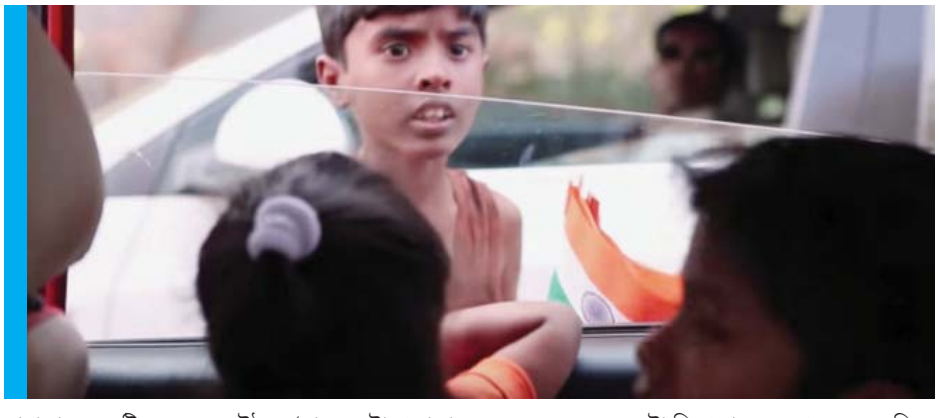

নামালাম। একটি মেয়ে বলে উঠল, ‘বাবু একটা পতাকা নিন না, খুব কম দাম পাঁচ টাকা। নিলে খুব উপকার হয়।’ চোখ-মুখ আর হাড়জীর্ণ চেহারা দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম এই বাচ্চাগুলোর দু’বেলার খাবারই ঠিকঠাক হয়তো জোটে না। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছি এই পতাকাগুলো বিক্রি করেই আজ ওদের বাড়ির হাঁড়ি চড়বে।

মনের ভেতর একটা বিষণ্ণতা ছেয়ে গেল। মনে হচ্ছিল স্বাধীনতার এত বছর বাদে অবন ঠাকুরের ভারতমাতার ছবিটা নষ্ট হতে হতে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস মানে উৎসব, বাজি পোড়ানো, আনন্দমুখরিত মুহূর্ত সব। অথচ এই দেশেই কারওর কাছে স্বাধীনতা দিবস মানে একবেলার খাবার জোটার দিন।

কলিকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

নায়ক এবং খলনায়ক অজিতেশ

শৈবাল পত্রনবীশ

‘মেয়েটা আমার বাঁচবে না ডাক্তার। ও যে আমার একমাত্র মেয়ে।’ ‘ছুটি’ ছবির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংলাপটা নিশ্চয়ই মনে আছে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর সম্পর্কে খুব কমই লেখা হয়েছে, কারণ বেশিদিন অভিনয় জগতের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন না। মাত্র ৫০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ খলনায়ক, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, অভিনয়ের ভ্যারিয়েশন অজিতেশকে এক অন্য মার্গে নিয়ে গিয়েছিল। খুব ছোটবেলায় আমরা থাকতাম ধানবাদে। বাবা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের খুব বড় রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মেডিক্যাল অফিসার। কিছুদিনের জন্য অজিতেশ সিন্ড্রি সার কারখানার কাছে পাথরডিহিতে থাকতেন। মোটামুটি জীবনের বেশ কিছু সময় তিনি ওই অঞ্চলেই ছিলেন। সেই ছোটবেলা থেকেই ওঁর নাম শুনতাম। অজিতেশ কোনও নাটক করতে এলেই আমাদের ওখানে বসার জায়গা পাওয়া যেত না। ওই দাপুটে অভিনেতা একাই নাটকের রত্ন হয়ে থাকতেন। অজিতেশের জন্মস্থান কোথায়? কোলিয়ারি অঞ্চল আসানসোলের কাছে। ওখানে স্কুল পাশ করে কলকাতায় এসে মণীন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। স্নাতক হন, কিছুদিন সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন, তারপর মণীন্দ্র কলেজেই অধ্যাপনা। আলাপ হল শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের সঙ্গে। এক সময় এঁরা তিনজনেই বাংলার নাট্যজগতে রাজত্ব করেছেন। তিনজনকে প্রায় একই রকম প্রতিভাবান বলে মনে করা হতো। ৪২ বছর বয়সে সংগীত-নাটক আকাদেমি পেয়েছিলেন অজিতেশ। সালটা ১৯৭৬। এই সম্মান সম্ভবত তিনিই সব থেকে কম বয়সে পেয়েছেন। মণীন্দ্র কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতে করতে আইপিটিএ-র সঙ্গে যুক্ত হন। গণনাট্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তিনি অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাটক পরিচালনাও করেন। এরপর যুক্ত হলেন ‘নান্দীকার’ নাট্যদলের সঙ্গে। পরিচয় হল রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কেয়া চক্রবর্তী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দিকে দিকে নাম ছড়িয়ে পড়ল। সাফল্যের পর সাফল্য। বেশিরভাগ নাটক বিদেশি কোনও লেখকের রচনা অবলম্বনে।

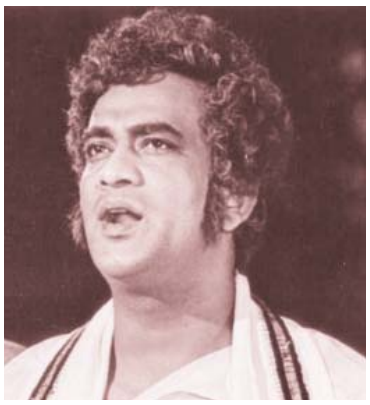

যেমন, চেকভ, অ্যান্টিগোনে ইত্যাদি। ধরা যাক, অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক ‘তিন পয়সার পালা’। ‘থ্রি পেনি অপেরা’র ছায়া অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল এই নাটকটি। সাফল্যের চূঁড়া ছুঁয়েছিল কয়েকটি নাটক। তারপরে নাট্যজগতে আরও সাফল্য। বলা হতো এই নাট্যগোষ্ঠী ভারতের সব থেকে ভালো, উন্নতমানের নাটক করে। অজিতেশের আরেকটি অসাধারণ অভিনয়সমৃদ্ধ নাটক ‘শের আফগান’। শম্ভু মিত্রের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব বলেছিলেন ‘অজিতেশ ভারতবর্ষের সব থেকে বড় নাট্যাভিনেতা।’ ১৯৭৭ সালে অজিতেশ ‘নান্দীকার’ ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিজের নাট্যগোষ্ঠী ‘নান্দীমুখ’ প্রতিষ্ঠা করলেন। নান্দীমুখের বেশকিছু নাটক জনপ্রিয় হল। এই সময় ডাক এল চলচ্চিত্র জগৎ থেকে। প্রথমে তপন সিংহের ‘হাটে বাজারে’, ‘অতিথি’। তারপর অরুন্ধতী দেবীর ‘ছুটি’। অভিনয় করেছেন তরুণ মজুমদারের ‘কুহেলী’, ‘গণদেবতা’ ইত্যাদি ছবিতে। অতঃপর ‘আজ কাল পরশুর গল্প’, ‘নিধিরাম সর্দার’, ‘হীরে মানিক’, ‘কপালকুণ্ডলা’ ছবিগুলিতেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় কাজ করেছিলেন। হিন্দি ছবির মধ্যে ছিল ‘সমঝোতা’। এত ব্যস্ততার ভিতরেও আকাশবাণীতে নাটকে অভিনয় এবং যাত্রা জগতেও কাজ করেছেন। স্টেজেও প্রচুর শো করতেন নিয়মিত। তিনি যখন অভিনয়ের মধ্যগগনে তখন অজিতেশ আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। বাংলা অভিনয় জগৎতে শূন্যতায় ভাসিয়ে চিরকালের মতো মাত্র ৫০ বছর বয়সে হারিয়ে গেলেন পৃথিবী থেকে। কিন্তু চিরস্থায়ীভাবে থেকে গেলেন আমাদের হৃদয়ে।

এই সপ্তাহে স্থানাভাবের কারণে ‘কলিকাতা to কলকাতা’ এবং ‘আলোচনা@কলকাতা’ প্রকাশ করা সম্ভব হল না

পরাধীনতা ও স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে বেতার

মনীষা ভট্টাচার্য

পর্ব-১২

জলাজঙ্গলে ভরা গোবিন্দপুর, সুতানটি ও কলকাতা। তারই মধ্যে বসবাসের জায়গায় মানুষ রয়েছেন, জমিদারও রয়েছেন। রয়েছেন কিছু আর্মেনিয়ান বংশোদ্ভূত মানুষ। শহর জুড়ে গঙ্গা। তাকে কেন্দ্র করে বন্দর। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা। মুনাফা। ব্রিটিশের আনাগোনা বৃদ্ধি। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপ নেওয়া। পরাধীন হল ভারত। শুরু হল স্বাধীনতা সংগ্রাম। অবশেষে ২০০ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, দেশভাগের দাগা নিয়ে স্বাধীনতা লাভ। দেখতে দেখতে সেই স্বাধীনতার ৭০ বছর পেরোতে চলেছে। আজকের রাত পেরোলেই সেই মুহূর্ত আসবে। এই স্বাধীনতায় বেতারের ভূমিকা কেমন ছিল? বেতারে তখন ব্রিটিশ শক্তিরই রাজ চলছে। ভারতীয়দের যুদ্ধ, আন্দোলন, সংগ্রাম তা-ও সেই ব্রিটিশেরই বিরুদ্ধে। ফিরে যাই সেই সূচনাপর্বে।

ব্রিটেন বেতার (বিবিসি) সম্প্রচার চালু হয় ১৯২৩ সালে, ভারতে বেতার কেন্দ্র (আইবিসি) প্রথম খোলা হয় বোম্বেতে ১৯২৭ সালে, একমাসের মধ্যে কলকাতাতেও। ভারতে আসেন লায়োনেল ফিলডেন। সম্প্রচার চালু না হতেই ঘোষণা করা হয় কোনও রাজনৈতিক বিষয় সম্প্রচার করা যাবে না। বড়লাট বা ছোটলাটরাও কোনও বেতার ভাষণ দেবেন না। ১৯৩৫ সালে ফিলডেন ভারতে এসে মহাত্মা গান্ধী, নেহরু, অরুণা আসফ আলি থেকে শুরু করে বড় বড় ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কথাও বলেন। নানা বাদানুবাদ, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের পরেও ফিলডেন তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন ভারতীয় বেতারকে সমৃদ্ধ করতে।

তখন দ্বিতীয় (১৯৩৯-১৯৪৫) বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে একদিকে ১৯৪২ সালে মহাত্মার ডাকে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন, এই সময়ই নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দিদের বিচার শুরু হয় লালকেল্লায়, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৬ সালে হয় বোম্বেতে নৌবিদ্রোহ। সবগুলি ঘটনাই ব্রিটিশ বিরোধী, কিন্তু প্রশ্ন হল এই ঘটনাগুলির সঠিক সংবাদ কি আকাশবাণীতে প্রচারিত

হয়েছিল? সুনীল দাশগুপ্তের কথায় পাওয়া যাচ্ছে, এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় প্রতিদিন কলকাতা ‘ক’ প্রচারতরঙ্গে প্রচারিত হতো অ্যান্টি-জাপান প্রোগ্রাম। সেই সময় ভারত সম্পর্কে উদ্দীপক কোনও কথা প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেত না। উচ্চারিত হতো না গান্ধীজির নামও। দেশাত্মবোধক গান বাজানো নিষিদ্ধ ছিল। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের ‘বন্দেমাতরম’ রেকর্ডটি পিন দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছিল।

ইতিহাস বলছে, এই সময় ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অসহিষ্ণু মনোভাব ধরা পড়ে। সেই সময় আকাশবাণীর বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচারকে প্রতিহত করার জন্য একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ নিয়েছিলেন ড. রামমনোহর লোহিয়া এবং তাঁর অনুগামীরা, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ঊষা বেন। বোম্বে শহরের একটি গোপন জায়গা থেকে অল্পক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও ট্রান্সমিটার চালু করে, সেখান থেকে টানা ১৯দিন হিন্দি, ইংরেজি ও মরাঠিতে কথিকা প্রচার করা হয়েছিল ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন নিয়ে। এরপর উদ্যোক্তাদের সবাই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন।

কবি শঙ্খ ঘোষের কলমে সেই সময়টা ধরা দিয়েছে অন্যভাবে। তিনি লিখছেন, ‘...অস্পষ্ট আভাস পাই আসন্ন পালা বদলের। কয়েকদিনের মধ্যে জিন্না আবারও ভয় দেখান গৃহযুদ্ধে। রেডিয়োর সামনে আবারও শুরু হয় তর্কবিতর্ক।’ এর থেকে স্পষ্ট, উত্তাল সেই সময়ের প্রভাব বেতারেও পড়েছিল। শঙ্খ ঘোষ আরও লিখছেন,

‘...রেডিয়োর সামনে আমরা ক’জন স্থির। বাজল বারোটার ঘণ্টা, রেডিয়োরই মধ্য থেকে জাগল সেই ধ্বনি। বাইরে দিকে দিকে বেজে উঠল শাঁখ, ভিতর থেকে শোনা গেল নেহরুর আবেগভরা গলা, এই মধ্যরাতে পৃথিবী যখন ঘুমন্ত, ভারত তখন জেগে উঠছে জীবনে, স্বাধীনতায়।’ সংগীতশিল্পী যূথিকা রায়ের স্মৃতিতে উজ্জ্বল স্বাধীনতার সেই মুহূর্তটি। তিনি এক জায়গায় লিখছেন, ‘জওহরলাল নেহরু যখন লালকেল্লা থেকে জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দিল্লি বেতার কেন্দ্র থেকে আমাকে গাইতে হয়েছিল সোনেকা হিন্দুস্তান...পণ্ডিতজিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।’

স্বাধীন দেশে ১৯৪৭ সালের এক শারদ সন্ধ্যায় সোদপুরের আশ্রম থেকে মহাত্মা গান্ধীর ভাষণ সম্প্রচারিত হল কলকাতা বেতারে। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় ফিলডেন সাহেব গান্ধীজির কণ্ঠপ্রচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার অনুমতি দেয়নি। পরে স্বাধীন ভারতে কলকাতা বেতারের ডিরেক্টর জেনারেল অশোককুমার সেন উদ্যোগী হয়ে গান্ধীজির কণ্ঠস্বর কলকাতা বেতারে প্রচার করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের এক বিকেলে সোদপুর আশ্রমের প্রার্থনাসভায় বসেছেন গান্ধীজি। সামনে রাখা হল মাইক্রোফোন। ভাষণ শুরু করলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে ছড়িয়ে যেতে লাগল ভারতাত্মার মর্মকথা, মৈত্রী ও শান্তির বাণী। তথ্য বলছে, ১৯৩৮ সালে গান্ধীজির ৭০তম জন্মদিনে শ্রোতাদের পক্ষ থেকে কলকাতা কেন্দ্রে তাঁর ভাষণ প্রচারের আবেদন করা হয়েছিল। দিল্লি সরকার সেই আবেদন অনুমোদন করেছিলেন দুটি শর্তে— ভাষণে কোনও বিতর্কিত রাজনীতি থাকবে না এবং তিনি যা বলবেন তার একটি লিখিত বয়ান আগে জমা দিতে হবে। এরপর যতবারই আবেদন করা হয়েছে দিল্লি সরকার তা অনুমোদন করেননি, বলেছেন, কোনও রাজনৈতিক নেতার জন্মদিনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর নীতি বন্ধ হোক, তবে ফিলডেন সাহেব ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবার জন্য দিল্লি বেতার কেন্দ্রে পা রেখেছিলেন গান্ধীজি।

নেতাজি-সম্পর্কিত একটি তথ্য দিয়ে এই লেখা শেষ করব। স্বাধীন ভারতে গান্ধীজির সঙ্গে নেতাজির নামও শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হতো। সেই সময় বেতারের জন্য সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একটি কথিকা প্রস্তুত করেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে দেশনেতাদের কিছু সমালোচনাও ছিল। কথিকাটি প্রচারের আগে তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর বেশ কিছুটা অংশ কেটে দেন। স্ক্রিপ্টের ওপর লাল কালির দাগ দেখে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ অত্যন্ত রেগে যান এবং বলেন, ‘রেডিও স্টেশনকে এই আমার শেষ নমস্কার। যে বাড়িতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা নেই সে বাড়িতে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আর কোনওদিন পা দেবে না।’ শোনা যায়, অনেক অনুরোধের পরও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। পরাধীন ভারতেও সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আকাশবাণীর বিরূপতা লক্ষ করা গেছে। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আকাশবাণীতে শিল্পীদের আনাগোনা যখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তখন একদিন ঘোষক সুনীল দাশগুপ্ত হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ‘কদম কদম বাড়ায়ে যা’ গানটি চালিয়ে দেন। এই অপরাধে তাঁর চাকরি যায় এবং স্বাধীনতার পরও তিনি তাঁর হৃত চাকরি ফিরে পাননি।

আজকের প্রজন্মের কাছে স্মৃতিকথাই ভরসা। সেই সময়ের চিত্র, অনুভূতি, উপলব্ধির সঙ্গে আকাশবাণী যেভাবে জড়িয়ে ছিল, তার কথা জানতে পারা যায় ‘কলকাতা বেতার’ শীর্ষক বইয়ে, বিভিন্ন মানুষের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে। স্বাধীনতার প্রাক্‌লগ্নে সেই স্মৃতি রোমন্থনেই আজকের বেতার কথা সাজালাম। জয়হিন্দ!

স্বাধীনতার সত্তর বছর। তবু কি সত্যিই স্বাধীন আমরা?

তন্ময় মণ্ডল

দেখতে দেখতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সত্তর বছরে পা রাখছে। ইংরেজদের কাছ থেকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমাদের দেশ যেমন স্বাধীন হয়েছে তেমনই আমরা এক নতুন ভারত পেয়েছি। সময়ের সাথে সাথে সমাজ বদলেছে, ক্রমশ বদলাচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। রাজনৈতিক পরিবর্তন, মানুষের জীবনধারণের আঙ্গিক সব কিছুরই প্রতিনিয়ত পালটে যাচ্ছে। আজকে এই স্বাধীনতার সত্তর বছরে দাঁড়িয়ে আমরা কতটা স্বাধীন? কতটা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারি নিজেদের মত? আমাদের জীবনের ওপর, মন ও মননের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তো? সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে বিভিন্ন অভিঘাত নিয়ে ধরা দেওয়া এই স্বাধীনতার প্রসঙ্গ নিয়ে আজকের যুক্তি-তর্ক-আড্ডা।

শিলাজিৎ (গায়ক, অভিনেতা): 'তুমি হায় বুঝবে কি ভাই/ ফুরফুরে দিন কেটে যায়/বোঝাচ্ছো স্বাধীনতার মানে/ যেও ধেনে দিনে রাতে/বুলেটে যে বুক পাতে/সে বুঝেছে স্বাধীনতার মানে'— আমার স্বাধীনতা গানটিতে বহু আগেই বলে দিয়েছি আমার কাছে স্বাধীনতার মানে। আসলে আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই স্বাধীনতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। সে ব্যক্তি স্বাধীনতা হোক কিংবা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন। একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমি গর্বিত। একজন ক্রিয়েটিভ মানুষের ক্ষেত্রে এই স্পেসটা খুব দরকার যেখানে সে তার নিজের আইডিওলজি বা নিজের চিন্তাকে মুক্তভাবে তার শিল্পকর্মে প্রতিফলিত করতে পারে। এটা অবশ্য ঠিক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। সব নেগেটিভিটিকে দূরে সরিয়ে আমাদের পজিটিভ ভাবতে হবে, ভালো কাজ করতে হবে। আর তাহলেই প্রকৃত স্বাধীনতা স্বার্থক হবে।

সিধু (সংগীতশিল্পী): পঁচিশ বছর ধরে তো রক মিউজিক করি আর রক মিউজিকের অন্যতম উপজীব্য হল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। 'যুদ্ধ এসেছে বুদ্ধ হেসেছে' থেকে 'রাজা তোর কাপড় কোথায়' এই যে অ্যান্টি-এসট্যাব্লিশমেন্ট গান গাইতে পেরেছি এত বছর, আমি মনে করি সেটাই স্বাধীনতা। বলবার জায়গাটা এখানে আছে। সরাসরি ব্যান করে দিতে পারে না। এমনটা কখনও এখানে হয়নি বা হয়তো হবে না যে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী কথাবার্তার জন্য ক্যাকটাস বন্ধ করে দাও। হয়তো চেপে দেওয়ার চেষ্টা হয় আড়ালে-আবডালে, কিন্তু সরাসরি আমাদের মুখ বন্ধ করা যায় না। এটাই স্বাধীনতা।

মারুফ হোসেন (প্রকাশক): স্বাধীনতার ৭০ বছর। ভাবতে বেশ লাগে। অথচ তার সুফল আমরা পাচ্ছি কই? বাংলা প্রকাশনা শিল্প ক্রমশ কৃশকায়। নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে তরুণ প্রকাশকেরা আসছেন কিন্তু এত ক্ষীণতনু বাজার তাঁদের সকল ভাবনাকে যোগ্য সঙ্গত করতে পারছে কই? স্বাধীনতার সত্তর বছরে বাংলা প্রকাশনা শিল্পের জন্য সদর্থক ভাবনা নিয়ে রাষ্ট্র প্রায় কিছুই করেনি। অথচ এই শিল্পে জড়িয়ে আছেন লক্ষাধিক মানুষ। বাংলা ভাষার সঙ্গে সকল ভাষার প্রসার ও প্রচারে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা চাই।

মনীশ মিত্র (নাট্য-ব্যক্তিত্ব): স্বাধীনতা!!! এ স্বাধীনতা কি? স্বাধীনতা কার? ভারতের স্বাধীন নাগরিক বলতে আমরা কাদের বোঝাই, আমাদের মতো নগরকেন্দ্রিক মানুষদের নাকি এই নগর থেকে দূরে প্রান্তিক জীবনের মানুষদের? এই স্বাধীনতা আমাদের কোথায় স্বাবলম্বী করে, এই স্বাধীনতা আমাদের কোথায় উত্তীর্ণ করে? ভারতের স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রশক্তি বদলের একটা ইতিহাস। ব্রিটিশদের হাত থেকে আরও একদল পুঁজিপতির হাতে রাষ্ট্রশক্তি বদলের গল্প। সাধারণ মানুষের জীবনের তার সাথে কোনও যোগ নেই। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যেমন থাকার কথা তেমন শোষণ আছে, অত্যাচার আছে, বিভেদ আছে বৈষম্য আছে। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমার ভাবতে অবাক লাগে যে দেশে একজন পদ্মশ্রী বা পদ্মভূষণ শিল্পীও সঠিক চিকিৎসাব্যবস্থা পান না। এ-দেশে একজন থিয়েটার-কর্মী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী ছ'হাজার টাকা মাসিক পান। আর যারা চা-বাগানে কাজ করেন, কয়লাখনিতে কাজ করেন, মাঠে চাষ করেন বা আরও প্রান্তিক মানুষ যাঁদের দু'বেলা আহার জোটে না তাঁদের কাছে তো স্বাধীনতা একটা কাকতলীয় শব্দ। একটা বায়বীয় অর্থহীন ইউটোপিয়া।

প্রচেত গুপ্ত (সাহিত্যিক): একটা দেশের নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের কাছে ভীষণ গর্বের যে স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর পার করে সত্তরে পা রাখলাম। সেই মানসিক গ্লানি তো এখন আমাদের নেই। এই সত্তর বছর ধরে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাই চলছে। এটা আমার কাছে বেশ সৌভাগ্যের যে আমি একটা স্বাধীন দেশে বসে লিখছি। সেই অর্থে বাধা বলতে কিছু নেই। স্বাধীনতার মানে তো গ্লানি থেকে মুক্তি, অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি। আমরা এগিয়েছি এবং ভাবতে ভালো লাগে যে সেই অধিকারটা আমাদের আছে। 'এটা ভালো হল না! কেন হল না?' এই কৈফিয়ত চাইবার জায়গাটা তো পরাধীনতার সময়ে ছিল না। সবকিছু দায় তো রাষ্ট্রের হতে পারে না। 'তুমি কেন ভাত দিলে না' এটা না বলে 'আমি কেন ভাত পাচ্ছি না' এটাও তো ভাবতে হবে। স্বাধীনতার যেমন অনেক প্রাপ্তি আছে না পাওয়াও আছে। সবচেয়ে বড় কথা তো এই না পাওয়াগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, সেই অধিকারটা কিন্তু আছে।

সুবোধ সরকার (কবি ও অধ্যাপক): আইনিভাবে হয়তো সত্তর বছর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু সেই দেশের বেশিরভাগ মানুষের জন্য এখনও খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই। ষাট শতাংশের বেশি মানুষ এখনও অর্থনৈতিক দিক থেকে পভার্টি লাইনের নীচে। আমার কাছে মনে হয় দেশ স্বাধীন সেদিন হবে যেদিন এই মানুষগুলো দু'মুঠো খেতে পাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন মনে করি আমি স্বাধীন এবং যখন দেশে কোটি কোটি মানুষ অভুক্ত থাকছে, তখন সেই স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে ওঠে। ভারতে যত খাদ্য আছে, যত সম্পদ আছে মানবিকভাবে তার প্রকৃত বণ্টন যদি হয়, তাহলে ভারতের প্রতিটি মানুষ খেতে পাবে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না আর ভারত সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া তৈরি করছে। আমরা তো স্বাধীনতা পেয়েও স্বাধীনতার বাইরে।

সুব্রত সাহা (চিত্রশিল্পী): ভারতে কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। আমার মনে হয় না পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এত স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করা যায়, বা নিজের বক্তব্য প্রকাশ করা যায়। একজন শিল্পী হিসাবে আমার স্বাধীনতা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না।

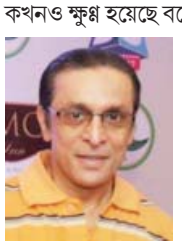

শুভাশিস মুখোপাধ্যায় (অভিনেতা): যদি কাজের ক্ষেত্রে বলতে হয় তবে বলব সুস্থ পরিবেশটা স্বাধীনতার অংশ। কাজের ক্ষেত্রে মুক্ত মনে কিছু করার স্বাধীনতাটা তো আছে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি অনেক থাকবে কিন্তু সুস্থ পরিবেশ থাকুক। মানুষ নিজের মতো করে বাঁচুক, এটাই কাম্য।

প্রদীপ ভট্টাচার্য (প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি): স্বাধীনতা আছে এবং নেই দু'টোই কিন্তু বিদ্যমান। স্বাধীনতা নামক বস্তুটিকে স্বাধীনভাবে আমি আমার রাজনৈতিক চিন্তা বা সমাজচিন্তার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারি। তেমনি অসহিষ্ণুতা বা অন্যের মতকে গলা টিপে মারবার বিরুদ্ধে এখনও রুখে দাঁড়াতে হয়, আগামীতেও হবে। আমাদের সমাজের জাগরণটা যেভাবে ঘটানো উচিত ছিল সেভাবে হয়নি।

শ্রীপদ বর (সরকারি কর্মী): স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। স্বাধীনতা ভোগও করলেও অনেক মানুষের কাছে স্বাধীনতা মানে একটা বাঁশের মাথায় পতাকা টাঙানো। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জীবনে কিন্তু খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। আর অসহিষ্ণুতা যেভাবে চারিদিকে ছেয়ে যাচ্ছে তাতে নিজের মত কোথাও প্রকাশ করবার আগেও ভাবতে হয়।

রিতিকা সামন্ত (আইটি প্রোফেশনাল): স্বাধীনতা মানে আলটিমেটলি ফ্রিডম। আমার কাছে আমার মতো করে থাকা। যেখানে সো-কলড মাসি-পিসি-মামা-মামিরা নাক গলাবে না। সেইভাবে দেখলে ফর দ্য লাস্ট সেভেন্টি ইয়ার্স ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। আইটি-র ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। আমার মনে হয় 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-পরিকল্পনাকে আরও স্বার্থকভাবে রূপায়ণ করে টেকনোলজিতে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং আমার কাছে স্বাধীনতা এক কথায় গ্লোবালাইজেশন।

সুদর্শন দাস (রিকশাওয়ালা): স্বাধীনতা মানে কী অত বুঝি না। জন্ম থেকে দেখেছি বাবা রিকশা চালাত, এখন আমি চালাই। এভাবেই সংসার চলে। ইনকাম ভালো হলে জীবনটা একটু ভালোভাবে চালাতে পারি। স্বাধীনতা বলতে কখনও আলাদা কিছু বুঝিনি।

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

আমার চোখে কলকাতা

তথাগত রায় (রাজ্যপাল, ত্রিপুরা)

প্রথম পাতার পর

আমি শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কলেজে পড়েছিলাম। ওখানে 'গেস্টকিন উইলিয়ামস' নামে কারখানা ছিল। এত বড় কারখানা একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতেই প্রায় একঘণ্টা সময় লাগত। কিন্তু আজ ভাবতে খারাপ লাগে অতবড় কারখানাটির আজ আর কোনও চিহ্নমাত্র নেই। পাশাপাশি জেসপ-এর কারখানা ধুঁকছে, ডানলপ-এর কারখানার মৃতপ্রায় অবস্থা। আমাদের চোখের সামনেই একটার পর একটা কারখানা উঠে গেছে। বেড়েছে বেকারের সংখ্যা। এই অবস্থাই কলকাতার অর্থনৈতির অবতরণের মূল কারণ। আর এই অবতরণের ফলে কলকাতার আর সব ক্ষেত্রেই অবতরণ হয়েছে।

তবে এগুলি বাদ দিলে কলকাতা সংস্কৃতির শহর। ফুটবল আছে এই শহরের মানুষের মনে।

স্বাধীনতার ৭০ বছর আমরা পার করলাম। বলতে খুব খারাপ লাগে এতগুলো বছর পরও আজকের দিনে দাঁড়িয়েও কলকাতার অবস্থার উন্নতির কোনও আশা দেখতে পাচ্ছি না। শুধু হচ্ছে 'কন্যাশ্রী', 'হাওড়াশ্রী', 'সেরা বাঙালি'...এই সব। আমার মনে হয় না এতে কলকাতার খুব একটা ভালো কিছু হবে। আর আমাদের মতো বৃদ্ধরা যাঁরা একটি ঘরে আলো জ্বালিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, সম্ভবত কলকাতাও এই মুহূর্তে তাই করছে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

প্রিয় বন্ধু @ কলকাতা

মিটার বাড়ছে পাবলিক টেলিফোনে

বীথি চট্টোপাধ্যায়
(লেখিকা)

মোবাইলে হঠাৎ চার্জ চলে গেল। সঙ্গে চার্জার নিয়ে বেরোইনি। এদিকে বাড়িতে ফোন করে জানাতে হবে যে একজন একটা চিঠি নিয়ে আসবেন বেলা তিনটের সময়, তাই বাড়িতে যেন কেউ থাকে। না হলে চিঠি ফিরে যাবে। কিন্তু মোবাইলে চার্জ নেই। কলকাতায় একটা মিছিল বেরোবে বলে আজ গাড়ি নিয়েও বেরোইনি। উবের ধরে এসেছি নিউ মার্কেট অঞ্চলে।

তাহলে বাড়িতে জানাব কীভাবে? আশেপাশে যাঁরা হেঁটে যাচ্ছেন তাঁদের থেকে সাহায্য চাইতে হবে। তাঁদের ফোন থেকে ফোন করে দিতে হবে বাড়িতে।

দশ বছর আগেও এই শহরের প্রতিটি রাস্তায় তিন-চারটে করে এসটিডি বুথ ছিল। কিছুদিন আগে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। দেখলাম সেখানে অনেক এসটিডি ফোনের বুথ রাস্তায় রাস্তায়। দিল্লির অনেক টেলিফোন বুথ এখনও বেঁচে আছে, কিন্তু কলকাতায় আর কোথাও ফোনের বুথ নেই। এই নিউ মার্কেট এলাকাতেই একটা গলির মধ্যে কোনও দৈবক্রমে রয়ে গেছে একটা ফোন বুথ; কিন্তু সেই বুথের ফোন তুললে কোনও শব্দ পাওয়া যায় না। তার মানে এই ফোন থেকে কোনও ফোন করা সম্ভব নয়। তাহলে এই এক চিলতে জায়গাটি এসটিডি বুথ নাম দিয়ে রেখে দিয়েছে কেন এরা? এখানে তো ফুটপাথের ধারে চিলতে জায়গারও দাম আছে। এরকম অবাক ব্যাপার এই শহরে যে কত ছড়িয়ে রয়েছে।

যাইহোক আমি ভাবছিলাম টেলিফোন নিয়ে। রাস্তায় একজন অচেনা লোকের ফোন থেকে বাড়িতে ফোন করে বলে দিলাম যা বলবার ছিল, কিন্তু কোনও ফোন বুথ পেলাম না। অথচ দিল্লি হোক, মুম্বই হোক প্রচুর পিসিও রয়ে গিয়েছে রাস্তার ধারে ধারে। কিন্তু কলকাতায় প্রায় আর কোনও বুথ বেঁচে নেই। এর কারণ কী হতে পারে? দিল্লি-মুম্বইতেও তো সকলের হাতে মোবাইল। ওরা কলকাতার থেকে আরও বড়লোক শহর। তাহলে কলকাতার এমন কী হল যে সব বুথ উঠে গেল?

পুরনো নিউ মার্কেটের ভিতর যেখানে একটা পাঁচমাথার মোড় সেখানে একসঙ্গে চারটি টেলিফোন বুথ ছিল জড়াজড়ি করে। এখন বুথগুলোর মধ্যে তিনটি বুথ তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বাকি একটা বুথে একটা আইসক্রিম পার্লার হয়েছে।

আইসক্রিম পার্লারটা দেখে মনে হল ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়াই। না হয় একটা আইসক্রিম খেলামই। চুয়াত্তর-পঁচাত্তর সাল থেকে চারটে বুথ এখানে রয়ে গিয়েছে। কলেজে যখন পড়ি তখনকার কত প্রেম আর নিদারুণ বিচ্ছেদের সাক্ষী এই বুথগুলো। অবুঝ বয়েসের কত অবুঝ কথা এই বুথের ভেতরে ছোট্ট খুদি ঘরে জমে আছে। বাইরে প্রবল বৃষ্টিও পড়ছিল। পুরনো নিউ মার্কেটের ঢাকা জায়গা থেকে বেরোলে এখন পুরো ভিজেও যাব। সঙ্গে ছাতাও আনিনি। আর হাতে কোনও কাজও নেই। তাই বুথের বদলে যে আইসক্রিম পার্লারটা সামনে সেখানে কিছুক্ষণ থাকাই যায় ভাবলাম।

আইসক্রিমের দোকানে এগিয়ে গেলাম। ওইটুকু ছোট দোকান তার সারা দেওয়াল জুড়ে দেখলাম শুধু ঠাকুরের ছবি। মা কালী, গণেশ, আরও অনেকে। এক বাঙালি যুবক দোকানে বসে। কিন্তু দোকানে থেকে বেশ জোরে জোরে হিন্দি ভক্তিগীতি বাজছে। 'ওম জয় জগদীশ হরে...' হতেই পারে। এরা হয়তো ভারি ভক্ত মানুষ। আমি আইসক্রিমের ফরমাস করে দোকানের সামনের ছোট টুলে বসলাম। অনেক হাঁটাহাঁটি করে আমি বেশ ক্লান্তই ছিলাম।

ছেলেটি আইসক্রিম বানাতে বানাতে বলল, 'একশো দশ'।

আমি একশো দশ টাকা দিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দোকানটা বুঝি নতুন? কয়েকমাস আগেও দেখিনি তো?'

ছেলেটি কর্মব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'চারমাস'।

আমি বললাম, 'ও তাই বলুন। এখানে তো অনেক আগে পাবলিক টেলিফোন বুথ ছিল। এখন তো সব বুথ উঠে গিয়েছে। যেখানে বুথ ছিল সেখানে সব অন্য নানারকম দোকান হয়েছে। আপনার দোকানের গায়েই তো আরও তিনটে বুথ বন্ধ পড়ে রয়েছে। পরেরবার হয়তো দেখব এসে ওখানে অন্য দোকান হয়ে গেছে।'

ছেলেটি আমার হাতে আইসক্রিম দিল। ওখানে কোনও দোকান কেউ করবে না। এই দোকানও এখুনি আমি বন্ধ করব। আপনি বলছিলেন কী আইসক্রিম পার্সেল নেবেন তাড়াতাড়ি বলুন। আমি আর বেশিক্ষণ এখানে থাকব না।

আমি অবাক হলাম খুব। 'কেন এখন তো মোটে আড়াইটে বাজে। এই বাজার তো রাত আটটা অবধি খোলা থাকে, এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেবেন কেন?

ছেলেটি যেন ফুঁসে উঠল, 'আমার দোকান আমি যখন খুশি তালা দেব? আপনার কোনও প্রোবলেম আছে?'

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। হাতের ব্যাগগুলো গুছিয়ে উঠে পড়তে উদ্যত হলাম।

দোকানের ছেলেটি একটু লজ্জা পেল বোধহয় নিজেই। আমাকে বলল, 'আপনি বসে খাওয়া ফিনিশ করতে পারেন। আসলে জানেন না দিদি কী ঝামেলা রোজ পোয়াতে হয়। রোজ রাতে এই বুথে ভূত আসে। এসে ফোন করে। গানও শোনা যায় মাঝে মাঝে। দুপুরবেলায় এইদিকটা ফাঁকা হয়ে আসে তাই আমি দুপুরে এখান ছেড়ে পালাই। আবার বিকেলে এসে অন্ধকার হবার আগে পালিয়ে যাই।'

না হেসে উপায় রইল না। বললাম, 'তাই বুঝি এত ঠাকুরের ছবি লাগিয়েছেন আর ঠাকুরের গানও বাজাচ্ছেন। তা কাজ হচ্ছে না?'

ছেলেটি বলল, 'এই ঠাকুরের ভরসাতেই তো বেঁচে আছি দিদি। পেটের দায়ে দোকান দিয়েছি। যদি জানতাম এই বুথগুলো ভূতের বাড়ি, তাহলে এখানে দোকান করতাম না। এখন পয়সা দিয়ে দোকান দিয়েছি এবার কী হবে বলুন।

আমি বললাম, 'দূর এমন আবার হয় নাকি। ভূত কখনও ফোনে কথা বলবে না গান করবে? ওগুলো মিথ্যে রটনা। কেউ হয়তো কোনও স্বার্থে এখানে দোকান করতে দিতে চায় না। তাই এসব রটাচ্ছে।'

ছেলেটি জোরে মাথা নাড়ল। 'না ওসব রটনা-ফটনা নয়। রাতের দিকে এদিকে এলেই বুঝতেন। কুত্তাগুলো পরিত্রাহি কাঁদে। ওরা দেখতে পায় তো। আর একটা কুলি একবার ধপাস করে সেন্স হারিয়ে ফেলল পড়ে গিয়ে। তার সামনে সে দেখল একটা লম্বা লোক বুথের ভিতর থেকে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল।'

আইসক্রিম পার্লারের টাকা মিটিয়ে বাইরে খোলা জায়গায় এসে গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

তাহলে কলকাতার বুথগুলো এখন ভূতের বাসা হয়েছে। কলকাতায় এত মানুষ ভূতের তো নতুন নতুন বাসস্থান খুঁজে পেতে হিমসিম খায় শুনেছি। এখন তাহলে ভালোই হয়েছে প্রচুর পুরনো বন্ধ হওয়া এসটিডি বুথে ভূতেরা যেতে পারে।

লম্বা মতো কেউ একটা পুরনো নিউ মার্কেটের বন্ধ হওয়া বুথে প্রায়ই আসে ফোন করতে। কোন নম্বরে সে ফোন করে? এই অ্যানড্রয়েড যুগে? 'ঘরে বসে সারা দুনিয়ার সাথে / যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে/ ঘুচে গেছে দেশ কাল সীমানার গণ্ডি।' আমি নিজে বানিয়ে বানিয়ে গুনগুন করলাম, উঠে গেছে সব টেলিফোন বুথ / সেখানে এখন ফোন ধরে ভূত / শহরের মুখ পুরনো স্মৃতিতে বন্দী.... আহাহা। মহীনের ঘোড়াগুলোর এই গান যখন শহর তোলপাড় করছিল তখন মোবাইল ফোনের কথা কেউ ভাবতেও পারত না। অথচ গানটা এইসময়ের স্মার্টফোনের সঙ্গে কী ভীষণ মিলে গেছে। 'মহীনের ঘোড়াগুলো' যখন লেখা হয় তখন শহরে মোবাইল, ডিশ অ্যান্টেনা কিছুই ছিল না। জাগতিক দুনিয়ায় গুগুল, চর্মেও আসেনি। সেইসময় দশ-বারোবার রং নম্বরের পেরিয়ে গিয়ে পিসিও থেকে বেলা বোসকে কোনও যুবক বলত 'মিটার বাড়ছে পাবলিক টেলিফোনে? বেলা বোস তুমি শুনতে পাচ্ছ কি?'

দশ-বারোবার রং নম্বর পেরিয়ে তোমাকে পেয়েছি / দেবো না কিছুতেই আর হারাতে।' তারপর 'মহীনের ঘোড়া'য় জিন দিয়ে দুনিয়া ছুটতে শুরু করল। কলকাতাও বদলে গেল বদলেরই নিয়মে।

ল্যান্ডফোনগুলো সের দরে বাড়ি থেকে বিক্রি হয়ে গেল। বেলা বোসরা এখন স্বাবলম্বী। 'চাকরিটা' তারা নিজেরাই এখন পেয়ে যায় আগে। আর পাবলিক টেলিফোন বুথগুলোর মিটারবক্সগুলো অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে বছরের পর বছর ধরে। রাতে যখন শহর নিশ্চুপ হয়ে যায়, মোবাইল ফোন রেখে শহর ঘুমিয়ে পড়ে তখন এই শহর থেকে এক স্মৃতির শহর বেরিয়ে এসে হয়তো পড়ে থাকা পাবলিক টেলিফোন থেকে ফোন করে কাউকে। করে বলে 'দিন না ডেকে বেলাকে একটিবার/ মিটার বাড়ছে পাবলিক টেলিফোনে/ দশ-বারোবার রং নম্বর পেরিয়ে তোমাকে পেয়েছি/ জরুরি খুব জরুরি দরকার।'

আইসক্রিম পার্লারের ছেলেটি বুঝতে পারছে না এই শহরের স্মৃতিসৌধের পাশে ওর দোকান দিয়েছে ওর সামনে এসে স্মৃতি দাঁড়িয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিপাশা চক্রবর্তী, সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

বনেদিবাড়ির পুজো @ কলকাতা

বন্ধ বলিপ্রথা, ঐতিহ্য ও রীতি মেনে বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়ির পুজো

বিপাশা চক্রবর্তী

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের বাড়ির পুজোর কথা। প্রাচীনতার দিক দিয়ে অনেকটাই এগিয়ে। এই পুজো প্রায় ৪০০ বছর অতিক্রান্ত করল। বর্তমানে জমিদারির সেই জৌলুস না থাকলেও ঐতিহ্য ও রীতি মেনে আচার-অনুষ্ঠান ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে বংশ পরম্পরায় এই পুজো হয়ে আসছে। একটা সময় বলি প্রথার প্রচলন থাকলেও আজ সেসব বন্ধ। শোনা যায়, একটা সময় নাকি এই পরিবারের পুজোতে নরবলিরও প্রচলন ছিল। পুজোর সময় ছাড়া দুর্গাপ্রতিমা দর্শন করা যায় না। তবে সাধারণ মানুষের দর্শনের জন্য সারাবছর প্রতিমাচিত্র রাখা থাকে আটচালায়। পুজোর কটা দিন পরিবারের সমস্ত সদস্য এক ছাদের তলায় এসে জড়ো হন। বাড়ির মেয়ে বউরা পুজোর বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। পুজোর কয়েকটা দিন বোধনের দিনের মতোই মায়ের জন্য ভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

পরিবারের পুজোর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানা গেল বংশের ৩৩তম বংশধর সুভাষ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে। এই মুহূর্তে ৩২, ৩৩, ৩৪তম বংশধরদের সমন্বয়ে এই বাড়ির পুজো হয়ে আসছে। বংশের ২২তম পুরুষ ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। আশ্বিন মাসে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন ওঁর জন্ম হয়েছিল বলে ওঁর নাম রাখা হয়েছিল লক্ষ্মীকান্ত। তিনিই এখানকার প্রথম জমিদার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ২৫তম পুরুষ কেশবরাম রায়চৌধুরী ১৬০০ শতাব্দীর শেষের দিকে আদি নিবাস নিমতা ছেড়ে এই বড়িশা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। পরে সন্তোষ রায়চৌধুরী মহাশয় বংশের ২৬তম পুরুষ এখানে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল ও ধর্মপরায়ণ মানুষ। কালীঘাটের মন্দিরও তাঁরই প্রতিষ্ঠা করা। ১২ শিবের মন্দির, রাধাকান্ত মন্দির ওঁদেরই প্রতিষ্ঠা করা। একই জায়গায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করেছিলেন। যেমন— একদিকে শিব, একদিকে কৃষ্ণ, মহামায়া আদ্যশক্তি রূপ ও কালীঘাটের মন্দির। সেই থেকে একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পুজো চলে আসছে।

কিছু বছর আগে আটচালাটি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। আগে একটা সময় এখানে হোগলা পাতার ছাউনি দেওয়া ছিল। এই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা যেখানে কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটি হস্তান্তর হয়েছিল। এখানেই দুর্গাপুজো হয়। কিন্তু মন্দিরের বেদিটি এখনও পুরনো মাটিরই তৈরি। অর্থাৎ চারশো বছরের সেই আদি ও অকৃত্রিম মাটি। পুজোর তফাত কিছু না হলেও জমিদারি আমলের সেই জাঁকজমক না থাকলেও সেই রীতিনীতি মেনেই এখানে পুজো চলছে।

এই পরিবারের দুর্গাপ্রতিমার গায়ের রং এখানে শিউলি ফুলের বোঁটার রঙের, অসুরের গায়ের রং হয় পাকা বেল পাতার মতো একদম গাঢ় সবুজ, গণেশ লাল, কার্তিক হলুদ, সরস্বতী সাদা, আর লক্ষ্মীর গায়ের রঙ হয় মা দুর্গার গায়ের রঙের মতো। 'ভক্তিতরঙ্গিনী' পুঁথিতে যেভাবে ঠাকুরের রূপ বর্ণনা করা হয়েছিল সেইভাবে প্রতিমা তৈরি করা হয়। এই পরিবারে তান্ত্রিক মতে পুজো হয়।

একচালে ঠাকুর থাকেন। প্রতিমা এখানেই তৈরি হয়। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হলে তারপর প্রতিমা তৈরি করা শুরু হয়। পুজোর সময় মা দুর্গাকে সোনার গয়না পরিয়ে সাজানো হয়। মাথায় সোনার মুকুটের পাশাপাশি গলায় সোনার হার, নাকে নথ, নাকছাবির সঙ্গে ঢাকের সাজ তো থাকেই।

কৃষ্ণপক্ষের নবমী অর্থাৎ দুর্গাপুজোর ১৫ দিন আগে যে নবমী হয় তখন দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যায় বোধনের মাধ্যমে। রামচন্দ্র যে অকালবোধন করেছিলেন সেই রীতি মেনে আলাদা একটি ঘরে দুর্গা মায়ের আরাধনা শুরু হয়। নিত্য চণ্ডীপাঠ ও পুজোর মাধ্যমে ষষ্ঠী পর্যন্ত ওই ঘরেতেই দুর্গাপুজো হয়। সেই সময় ভোগের বিশেষ রীতি হল সকালে ফলের নৈবেদ্য, দুপুরে অন্নভোগ। অন্নভোগের মধ্যে থাকে খিচুরি, সাদা ভাত, পোলাও, মাছ ও পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে দুপুরবেলার ভোগ নিবেদন করা হয়। রাতে শীতল ভোগ হল লুচি, মিষ্টি ও দুধ। এইভাবে বোধনের সময় ভোগের ব্যবস্থা করা হয় মায়ের জন্য। ষষ্ঠীর দিন বিকেলে নতুনভাবে অনুষ্ঠান করা হয়। ষষ্ঠীর দিন দুর্গাপ্রতিমার চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুজো শুরু হয়। তবে ভোগ তিনরকম হয়। একটি হচ্ছে মা দুর্গার ভোগ। সেটি অবশ্যই আমিষ ভোগ। মা দুর্গাকে মাছ দেওয়া হয়। আগে যখন বলিপ্রথা ছিল তখন মাংস দেওয়া হতো। জ্যান্ত পাঁঠার মাথা ও তার রক্ত দেওয়ার রীতি ছিল। তবে বর্তমানে বলি বন্ধ হয়ে গেছে বলে মা দুর্গাকে মাছ দেওয়া হয় না। অতীত থেকেই মা দুর্গাকে মাছ দেওয়ার রীতি চলে আসছে।

সন্ধিক্ষণে যে পুজো হয় সেই পুজোর সময়কে সন্ধিপুজো বলা হয়। সন্ধিপুজোর রীতি হল যিনি পুজো করবেন, তিনি নির্জলা উপোস থাকবেন। অষ্টমীর ২০ মিনিট ও নবমীর ২০ মিনিটের মধ্যেবর্তী যে সময় সেই সময়কে সন্ধিক্ষণ বলা হয়। আর ভোগ রান্না হবে প্রথম ২৪ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পরের ২৪ মিনিটের মধ্যে।। ভোগ তৈরি হবে গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে, তাতে থাকবে সৈন্ধব নুন ও হলুদ। মাটির মালসা অথবা পিতলের মালসাতে কাঠের জ্বালানিতে রান্না হবে। এছাড়া ল্যাটা মাছ পোড়া দেওয়া হয়। এটি হল সন্ধিপুজোর ভোগ। তবে আর দুটি ভোগ হল গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ ও শিবের। তিনটি ভোগ তিনজন দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। মা দুর্গার ভোগ ছাড়া বাকি ভোগগুলি নিরামিষ ভোগ।

তবে বর্তমানে সমাজের নানা পরিবর্তনের কারণে একটা সময় এই পুজোতে বলিপ্রথার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তা বন্ধ রাখা হয়েছে। আগে দুটো মোষ, ১৩টি পাঁঠা, দুটো চালকুমড়ো, একসঙ্গে তিনটি আঁখ বলি দেওয়ার রীতি ছিল। সপ্তমীতে ১টি বলি, অষ্টমীতে দুটি, সন্ধিপুজোর সন্ধিক্ষণে ১টি, নবমীতে ৯টির সঙ্গে দুটি মোষ ও বলি দেওয়া হতো। পুজোতে নরবলির প্রতীক হিসাবে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হত। চালকুমড়ো ও আঁখ-এর গায়ে একটি নরকঙ্কাল এঁকে বলি দেওয়া হতো। একটা সময় নাকি নরবলির রীতি ছিল। তবে সেই ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তবে আজ চার-পাঁচ বছর হল এই পরিবারে বলিদান প্রথা বন্ধ।

এই বাড়ির পুজোয় প্রায় ১৫-২০ বছর আগের একটি অলৌলিক ঘটে ছিল। সন্ধিপুজোর সময় দুধের দরকার হয়। সেই বছর সন্ধিপুজোর সময় ছিল রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ। হঠাৎ জানা গেল সন্ধিপুজোতে যে পরিমাণ দুধ লাগবে তার ব্যবস্থা নেই। অতো রাতে দুধ পাওয়া খুব মুশকিল। দোকানপাটও বন্ধ। পরিবারের সদস্যরা সকলেই চিন্তায় পড়েন। দুধের সন্ধানে আশেপাশে গরুর খোঁজ করা হয়। কিন্তু জানা যায় আশেপাশের কোনও গরু তখন দুগ্ধবতী নয়। হঠাৎ সেই রাতে একটি গরু বাছুর সমেত আটচালার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই গরুটির কাছ থেকে সন্ধিপুজোর জন্য প্রয়োজনীয় দুধের ব্যবস্থা করা হয়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় ওই গরুটি ওই এলাকার কোনও পরিবারের গরু নয়, এমনকী এই ঘটনার পর থেকে ওই গরুটির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য কোনও বিশেষ দিন কিছু নেই। সোম, মঙ্গলবার বলে আলাদা কিছু নেই। ঘট নেড়ে প্রতিমা বিসর্জনের পরেই হয় বিজয়া দশমী। বাড়ির রীতি অনুযায়ী পাঁজি দেখে প্রতিমা গঙ্গাবক্ষে রওনা হয়। তবে রীতি অনুযায়ী সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিমা বিসর্জনের পর পাড়ার অন্যান্য প্রতিমা বিসর্জন হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই রীতিই চলে আসছে।

এই পরিবারের নিত্যপুজো হিসাবে পূজিত হন রাধাগোবিন্দ। ৪২ বছর ধরে নিত্যপুজোতে কুলপুরোহিত হিসাবে সেবা করে চলেছেন বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। একমাত্র দোলের দিন এই বিগ্রহ-র পায়ে আবির দিতে পারেন সাধারণ মানুষ, তাছাড়া অন্যান্য সময় এই বিগ্রহ অন্য কেউ ছুঁতে পারেন না।

ফোটো: লেখিকা

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

নালে-ঝোলে কাঁকুড়গাছি

সৈকত ঘোষ

তোমার ঝাল লেগেছে বলে কি আমার ভালো লাগতে নেই? প্রশ্নটা শুরু হয়েছিল এখান থেকেই। কিন্তু তাই বলে অঞ্জন দত্ত এই নিয়ে গোটা একটা সাত কাণ্ড রামায়ণ থুড়ি গান বানিয়ে বাঙালিকে নাকানি-চোবানি খাওয়াবেন তা কে জানত... যাই হোক যতই তোমার ঝাল লাগুক আর আমার ভালো লাগুক কিংবা বাঘমামা যতই ঘরে না থাকুক আপনার হার্টবিট কিছুটা হলেও গতিমান হয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। আখেরে রুমাল থেকে বাঘের মাসি বেরিয়ে এসেছেন বলে কথা। কিন্তু এটা কিন্তু পলাশির যুদ্ধ নয় যে মুখস্থ করে দশ পাতা নামিয়ে দিলেই কেল্লাফতে... এটা হলো গিয়ে মনের ব্যাপার, খাবারের সাথে মানুষের টেস্টের ব্যাপার। সুতরাং গুরুত্ব না দিয়ে উপায়! আর আমরা সবাই জানি টেস্ট ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। রামবাবুর খাসি পছন্দ বলেই যে আপনার মুরগি ভালো লাগতে পারে না তারও কোনও মানে নেই। তাহলে 'আব রুচি খাওয়া'— এই প্রবচন মেনে নিয়েই সামনের দিকে এগোনো যাক। এতে এমসিকিউ যুগে দশে দশ না হোক নয় যে পাবেন সে গ্যারান্টি আমার।

মনে করুন কলকাতার বুকে এদিক-ওদিক হাঁটতে হাঁটতে আপনি পৌঁছে গেছেন কাঁকুরগাছিতে। আর এসে যখন পড়েইছেন তখন শুধু গন্ধ শুঁকে চলে গেলে চলবে? একটা যুতসই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে না! দরজা ঠেলে সোজা ঢুকে পড়ুন 'সিরাজ গোল্ডেন রেস্টুরেন্ট'-এ। এক কথায় কাঁকুড়গাছি অঞ্চলের বেস্ট বিরিয়ানির দোকান এইটি। খাবার পর ঝাল না লাগুক, আপনার ভালো অবশ্যই লাগবে। তবে এই কাঁকুরগাছি অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো বসার তথা খাওয়ার জায়গা অবশ্যই 'রোজ'। এখানকার চিকেন বেবিকর্ন সুপের কোনও তুলনা হয় না। সাথে মেইন কোর্স চাইলে অর্ডার করতে পারেন চিকেন বিরিয়ানি উইথ চিকেন রেজালা। পেটপুজো জমে উঠতে আর কী চাই...আর একটু এগোতেই ইএসআই হসপিটালের ঠিক বিপরীতে চোখে পড়বে 'হানি দ্য ধাবা'। শুধু খাবারের বিশেষত্ব নয় নামটির মধ্যেও একটা ক্রনিক খিদে আছে। এখানকার কাশ্মীরি পোলাও সাথে চিকেন ভার্তা এক বাক্যে অমৃত। তবে পিজ্জাপ্রিয় বাঙালিদের জন্য রয়েছে হাতে গরম ডোমিনোজ। এখানকার ভ্যারাইটি আপনার রসনাকে তৃপ্তি দেবে। মনে মনে এঁকে রেখে যাবে শ্রাবণের ধারার মতো আদরের দাগ। কাঁকুড়গাছি প্যান্টালুন্সে গেলে তাই একবার ঘুরে আসুন ডোমিনোজ থেকে। আর এত সবের মধ্যে বেশি সিরিয়াস হয়ে গেলে একটু রিলিফ আপনার জন্য মাস্ট। নির্দ্বিধায় চলে যান ভিআইপি মার্কেটের 'why so serious'-এ। এখানকার রক অন শাহি পান মশালা হুক্কা আপনার দিল আর দিমাগ কি বাত্তি জ্বালিয়ে দেবে। সাথে টেস্ট করতে ভুলবেন না এখানকার ফেমাস ব্ল্যাক কারেন্ট শেক।

আপনি একা, বৃষ্টি ধোয়া সন্ধে। হঠাৎ লোডশেডিং। কলকাতার রাস্তায় হাঁটছেন আর মনে মনে ভাবছেন একটু ঝাল ঝাল হলে মন্দ হতো না। তাহলে কাঁকুরগাছির 'টুটুনস ফাস্ট ফুড' রয়েছে আপনার সে ইচ্ছে পূরণের জন্য। এখানকার টেস্টি রোল বা চাউমিন আপনার মন ভালো করে দেবে। তবে রাতের খাবার খেতে চাইলে আছে 'Aqua Java Decibel'।

সিসিডি-এর ওপরের তলায় আছে 'The Firefly'- এখানকার ইতালিয়ান মেনু জিভে জল এনে দেবে। চিকেন স্প্রিং রোল, চিকেন রেশমি কাবাব এবং স্পেশাল প্যান ফ্রায়েড মোমো যে কাউকে দিওয়ানা বানিয়ে দিতে পারে। ফুলবাগান অ্যাপোলোর পাশে রয়েছে রেস্টুরেন্ট 'খাবার'। এখানকার বিখ্যাত ব্লু হেভেন মকটেল, সিঙ্গাপুর নুডলস উইথ টমেটো স্যুপ জাস্ট অসাম। তবে এখানকার যে দুটো রেস্টুরেন্টের নাম না করলে কাঁকুড়গাছির খাবার-দাবার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তারা হল 'সিলভার স্পুন' এবং 'বিয়ার রিপাবলিক'। সিলভার স্পুনের চিকেন মালাই কাবাব মটন দো পিঁয়াজি, গার্লিক নান এবং হরা ভরা কাবাব— একবার খেলে সত্যি বলছি স্বাদ ভুলতে পারবেন না। রাতের খাবারের প্ল্যান থাকলে রোজ কিংবা সিলভার স্পুন বেস্ট দুটো অপশন। আর কথায় আছে রাতের গল্প শুধু রাতই জানে। সুতরাং আপনার রাতকে একটু রঙিন করতে পৌঁছে যান স্বভূমির কাছে 'বিয়ার রিপাবলিক'-এ। এখানকার '69 হিলটপ ককটেল' রোজকার একঘেয়ে বোরিং জীবনের স্বাদ বদলে দেবে। ভালো না বাসলেও আপনি বেখেয়ালে গেয়ে উঠবেন 'তোমার ঝাল লেগেছে আমার ভাল লেগেছে'। আর এটাই হল এখানকার মহিমা। কি ভাবছেন কিছু একটা বাকি রয়ে গেল? এরপর পানিপুরি বা পাপড়ি চাট খেতে চাইলে কাঁকুরগাছিতে 'chat pata' আছে তো। তবে যাবার আগে মিষ্টিমুখ করতে চাইলে রয়েছে 'হরিয়ানা সুইটস'-এর কালাকাঁদ, 'nestal'-এর জিলিপি কিংবা হলদিরামের কাজুবরফি। এখন পছন্দ অনুসারে চোখ বুজে যে কোনও একটা বেছে নিন। শেষপাতে মিষ্টি আপনার সুগার লেভেলের কী হাল করবে জানি না, তবে পরেরদিনের শুরুটা যে বেশ মিষ্টি হবে এটুকু বলতেই পারি...

ইকো পার্ক

নেহা প্রধান

শহরের ইট-কাঠ-কংক্রিটের জঙ্গলের দৈনন্দিন একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণের জন্য সবুজ প্রকৃতির খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিতে চাইলে ঘুরে আসুন রাজারহাট নিউটাউনের প্রকৃতি তীর্থ ওরফে ইকো পার্কে। মহানগরী তিলোত্তমার একপ্রান্তে, রাজারহাট-নিউটাউনের বুকে অনেকখানি সবুজ নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই পার্কটি। সবুজ গাছগাছালিতে মোড়া বিশাল জলাশয়, সযত্নলালিত ফুলের বাগান, বাঁধানো রাস্তার পাশে সোলার ল্যাম্পের আলোয় সুন্দর করে সাজানো এই পার্ক যথার্থই 'প্রকৃতি তীর্থ'।

বর্তমান রাজ্য সরকারের উদ্যোগে, মধ্যিখানে ১০৪ একরের জলাশয়কে কেন্দ্র করে আশেপাশের প্রায় ৪৮০ একর বিস্তীর্ণ খোলা সবুজ প্রান্তরে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদপালনের মাধ্যমে সযত্নে ঢেলে সাজিয়ে তৈরি ইকো পার্ক। জনসাধারণের কাছে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে। আর তারপর থেকেই পার্কটির আকর্ষণ শহরবাসীর কাছে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। পার্কের প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ২০ টাকা মাত্র। এখানে হ্রদের জলে বোটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। প্যাডেল বোট, শিকারা, স্পিডবোট, ভটভটি-র মধ্যে থেকে আপনি বেছে নিতে পারেন আপনার পছন্দসই জলযান। আবার আপনি যদি একটু অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় হন তাহলে অংশ নিতে পারেন হ্রদের জলে কায়াকিং, ওয়াটার বাইক রাইডিং-এর মতো ওয়াটার স্পোর্টসে। এছাড়াও পার্কে রয়েছে একটি আইস স্কেটিং রিংক, ভার্চুয়াল গেমারদের জন্য আছে গেমিং জোন যার ঘণ্টাপ্রতি ভাড়া ৫০ টাকা। উদ্যানের ভিতরে নাচ-গান, নাটক ইত্যাদি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য অ্যাম্ফিথিয়েটার। এখানে মুক্তপ্রাঙ্গনের গ্যালারিতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করার আনন্দ একদমই অন্যরকম।

সারাদিনের ব্যস্ততার শেষে পড়ন্ত বিকেলের সূর্যাস্ত উপভোগ করতে বসে পড়ুন ঝিলের চারদিকে রাখা অসংখ্য বেঞ্চের কোনও একটিতে, খালি পায়ে ঘাসের উপর বসে পড়লে বাধাই-বা দিচ্ছে কে। এখানে প্রতিদিন সন্ধেবেলা ঝিলের মধ্যে মিউজিক্যাল ফাউন্টেন শো দেখতে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

হ্রদের পাশ দিয়ে বাঁধানো রাস্তা এঁকেবেঁকে বিভক্ত হয়ে চলে গেছে পার্কের বিভিন্ন প্রান্তে। এর কোনওটা ধরে আপনি পৌঁছে যাবেন রবি উদ্যানে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখনিতে উঠে আসা গ্রামবাংলার বিভিন্ন প্রজাতির গাছগাছালি সংগ্রহ করে এনে রোপণ করা হয়েছে। আবার কোনও রাস্তা ধরে কৃত্রিম ঝরনার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে পেয়ে যাবেন অসংখ্য প্রজাপতির বাহারি রংমিলান্তির ঠিকানা বাটারফ্লাই গার্ডেন। রয়েছে

কৃত্রিমভাবে সংরক্ষিত চা-বাগান, একটি ছোট গলফকোর্স। মূল পার্কটি তৈরি হয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট নয়নাভিরাম উদ্যান নিয়ে। প্রত্যেকটি উদ্যানই কৃত্রিম ঝরনা, পাথুরে টিলা, ফুলের গাছ, ছোট সুদৃশ্য ফোয়ারা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো এবং সবকটিই অত্যন্ত যত্নের সাথে দেখভাল করা হয়। এর মধ্যে গোলাপ বাগান, হেলিকোনিয়া গার্ডেন, বাঁশবাগান, বনসাই গার্ডেন অন্যতম উল্লেখযোগ্য। ছোটদের জন্য আছে বেশ কয়েকটি শিশু উদ্যান। ইকো পার্কে পেট্রল-ডিজেল চালিত যানবাহনের প্রবেশ নিষেধ। বদলে আপনি ব্যাটারিচালিত গল্ফকার্টে চড়ে পার্কের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আসতে পারেন। এছাড়াও ঘণ্টাপ্রতি ভাড়ায় পাওয়া যায় বাইসাইকেল, ডুয়ো-সাইকেল, রোলারস্কেট। পার্কের আলোকসজ্জা এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করতে ব্যবহার করা হয় সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল।

শুধুই ঘোরাঘুরি নয়, সেইসঙ্গে জম্পেশ পেটপুজো করে নিতে পারেন এখানকার ফুডকোর্টগুলিতে। চিকেন রোল থেকে মটন বিরিয়ানি— আপনার রসনাতৃপ্ত করতে উপস্থিত আছে সকলেই। পছন্দমতো খাবার নিয়ে খেতে খেতে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করুন প্রকৃতির সান্নিধ্য। তবে ইকো পার্কে বাইরের খাবার নিয়ে প্রবেশ বারণ। যে কোনও প্লাস্টিকজাত দ্রব্যও নিষিদ্ধ।

প্রকৃতি তীর্থের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল ঝিলের মধ্যে 'সবুজ সাথী' দ্বীপটি। ২২টি মনোরম কটেজ এবং প্রায় ২৮০০ বর্গ ফুট জায়গা নিয়ে তৈরি কাচে ঘেরা সুবিশাল কমিউনিটি হল সংবলিত সবুজ সাথীতে পৌঁছানোর জন্য জলযানই একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন— ঘরোয়া পার্টি, বিয়ে ও রিসেপশন, গেট টুগেদার বা অফিশিয়াল প্রোডাক্ট লঞ্চ ইত্যাদির জন্য কমিউনিটি হল এবং কটেজগুলি ভাড়া দেওয়া হয়। তবে বুকিং করে রাখতে হবে আগেভাগেই, কারণ এমন পরিবেশের চাহিদা যে তুঙ্গে হবে তা বলাই বাহুল্য।

এতদূর পড়ে কী ভাবছেন? এখনও না গিয়ে থাকলে সপরিবারে, সবান্ধবে অথবা আপনার প্রিয় মানুষটিকে সাথে নিয়ে ঘুরে আসুন রাজারহাট-নিউ টাউনের ইকো পার্ক। আশেপাশে চট করে ঘুরে দেখেও নিতে পারেন ওয়াক্স মিউজিয়াম, রবীন্দ্র তীর্থ, নজরুল তীর্থ বা কলকাতা মিউজিয়াম অব মর্ডান আর্ট। ইকো পার্ক জনসাধারণের জন্য মঙ্গল থেকে শুক্রবার দুপুর আড়াইটে থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত এবং শনি-রবি ও অন্যান্য ছুটির দিনে সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত খোলা। তাই দেরি না করে প্ল্যান করে ফেলুন আজই।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

কাদের পায়ের শব্দ শোনা যায় সিঁড়িতে

সোমনাথ আদক ও সৌরভ মণ্ডল

মাঝরাতে কারা উঁকি দেয় সেই বিশেষ ফ্লোরটিতে? ওয়াশরুমে কাদের ছায়ামূর্তি একঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়? কেনই-বা হঠাৎ খুলে যায় কনফারেন্স রুমের বন্ধ দরজা? কাদের পায়ের শব্দ শোনা যায় সিঁড়িতে? শহরের বুকে অশরীরী হানা? নাকি নেহাতি গুজব? হ্যাঁ, ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে! আর বিতর্কও চলতে পারে। তবে ঘটনা হোক বা রটনা, কিছু যে একটা আছে তা নিয়ে মোটামুটি সবাই একমত। কিন্তু সেটা কী ঘটনা না রটনা? এমনই অনেক প্রশ্ন উঁকি মারে ঝাঁ-চকচকে সেক্টর ফাইভের একেবারে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। না, এটা কোনও পুরনো সাহেব বাড়ি বা কবরখানা নয়। এটা উত্তর কলকাতার কানা গলির ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা হেরিটেজ তকমা পাওয়া শরিকি পুতুলবাড়িও নয়। কোনও পরিত্যক্ত বাংলো কিংবা আলো-অন্ধকার রহস্যের চাদরে মোড়া কোনও শ্মশান কিংবা নির্জন গঙ্গার ঘাটও নয়। খোদ কলকাতার বুকে সল্টলেকের কোল আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা সেক্টর ফাইভের এক জমজমাট কর্পোরেট অফিস, উইপ্রো ক্যাম্পাস—যার কপালে ভাঁজ ফেলেছে হানাবাড়ির দুর্নাম। কিন্তু কেন এবং কীভাবে সল্টলেকের এই স্মার্ট আইটি প্রোফেশনাল বোঝাই কর্পোরেট অফিসটি হয়ে উঠল সেখানকার কর্মীদের পিলে চমকে ওঠার কারণ! কি রহস্য লুকিয়ে আছে এই আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির অফিসে? কী বলছে সেখানকার কর্মী এবং নৈশ প্রহরীরা? সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে জানা দরকার এই অফিস সম্পর্কে।

কলকাতা তথা ভিনরাজ্যের বহু আইটি পাশ করা শিক্ষিত যুবককে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া প্রথম সারির আইটি কোম্পানির একটি হল এই উইপ্রো। কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের যে জায়গার ওপর উইপ্রো কোম্পানির সেই অফিসটি দাঁড়িয়ে আছে, লোকে বলে আসলে সেটা ছিল জঙ্গলে ঘেরা একটা পরিত্যক্ত কবরস্থান। এখানে যেমন অবাধে ঘুরে বেড়াত অপরাধীরা তেমনই অবাধে চলত অপরাধমূলক কার্যকলাপ। এখানে প্রায়শই লেগে থাকত খুন, ধর্ষণ, আত্মহত্যার মতো ঘটনা। আর যেহেতু জায়গাটা ছিল জঙ্গলে ঘেরা নির্জন কবরখানা, তাই লোকজনের যাওয়া-আসাও খুব একটা ছিল না। সেই কারণেই প্রকাশ্যে বা আলোকিত অন্ধকারে ঘটে যাওয়া অপরাধগুলো খুব একটা নজরে পড়ত না জনসাধারণের। তবে মাঝে মাঝেই এখান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ পাওয়া যেত। কেউ কেউ বলেন তাদেরই আত্মার অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে তথ্য-প্রযুক্তির এই অফিস। আবার সল্টলেক-রাজারহাটের পুরনো বাসিন্দাদের অনেকেই বলেন সেভেন্টিজের সেই উত্তাল সময়ের কথা। ১৯৭০ সালের সেই সময় পুলিশ এনকাউন্টার করার জন্য নাকি বেছে নিত এই জায়গাকেই। সেই সময়ে এখানে তথাকথিত এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে বেশ কিছু নকশাল কর্মীর। অনেকের ধারণা তাদেরও আত্মা নাকি এখনও এ জায়গার মায়াত্যাগ করতে পারেনি।

উইপ্রোর কর্মী এবং সোশ্যাল মিডিয়ার 'স্পুকি' অভিজ্ঞরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলছেন, দিনের বেলার ঝাঁ চকচকে স্মার্ট আইটি প্রোফেশনালদের ব্যস্ত উইপ্রোর চেহারা নাকি একেবারেই পালটে যায় সূর্যাস্তের পর। ক্রমশ এই ক্যাম্পাস ঘিরে নেমে আসে আতঙ্কের ছায়া। ঘটে চলে গা শিউরে ওঠার মতো হাড়হিম করা নানা ঘটনা। যে কারণে এই অফিসের তিন নম্বর টাওয়ারের তিনতলা বছরের বেশিরভাগ সময়েই তালা বন্ধ খালি পড়ে থাকে। এখানকার কর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, মাঝে মাঝেই রাতের শিফটে কাজ করার সময় নানা ছায়ামূর্তি দেখতে পান তাঁরা। ছায়ামূর্তিকে দেখা যায় অফিসের করিডোরেও। অনেক সময় কানের পাশে চাপা স্বরে অশরিরীর কণ্ঠস্বরও শুনেছেন বলে কেউ কেউ দাবি করেন। কেউ কেউ বলেন আসলে এই অফিসের তিন নম্বর টাওয়ারের তিনতলাটাই যাবতীয় অলৌকিক কার্যকলাপের আঁতুড়ঘর। এই বিল্ডিং-এর বেশ কয়েকটি ওয়াশরুমে বেশ কয়েকটি ছায়ামূর্তিকে প্রায়শই ঘুরতে দেখা গেছে। কখনও হঠাৎই কনফারেন্স রুমের বন্ধ দরজা করে খুলে গেছে। সিঁড়িতে শোনা গেছে কাদের পায়ের শব্দ। হাওয়া বা কোনও কম্পন ছাড়াই কাগজ ওলোটপালট হওয়া, বস্তু একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া এখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা। এখানকার এক নাইটগার্ড তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'এই অফিসের চারতলাটাও খুব একটা সুবিধার নয়। শোনা যায় চারতলা থেকে মাঝেমাঝেই নাকি চিৎকার-সোরগোল ভেসে আসে। এমনকী রাতে কোনও আহত মেয়ের আর্তনাদ আর কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। তাই এই অফিসের তিন এবং চারতলায় কোনও কর্মচারীকেই সাধারণত যেতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে নতুন কেউ এলে তাকেও আগে থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়, ভুলেও যেন ওদিকে না যায়।' ঘটনা থেমে থাকেনি এখানেই। এই অফিসের সামনের রাস্তায় এক রহস্যময়ী নারীমূর্তিকে মাঝরাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন সেখান দিয়ে ছুটে চলা গাড়ির আরোহীরা। তারা প্রতক্ষদর্শী হিসাবে দাবি করে অনেকেই জানিয়েছে এই বিশেষ এলাকাটিকে সন্ধ্যার পরে এড়িয়ে চলাই ভালো।

অবশ্য উইপ্রোর সাম্প্রতিক কর্মীদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা সামান্য হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেও নাইট ডিউটির কর্মীরা ভুল করেও একা কেউ ওয়াশরুমমুখো হন না।

পালটাচ্ছে
১৫ST
বিনোদন
খুব শীঘ্রই...

প্রয়োজনে লাগতে পারে

সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্স - ২২৪৮৫২৭৭

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাম্বুলেন্স) - ২২৩৯২২৩২, ২২৩৯২২৩৩

বেল ভিউ নার্সিং হোম - ২২৪৭৭৪৭৩, ২২৪৭২৩২১

কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট - ২৪৫৬৭০৫০, ২৪৭৯২৫৬১

ক্যালকাটা হসপিটাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ - ২৪৫৬৭৭০০, ২৪৭৯১৮০৫

এসএসকেএম হসপিটাল (পিজি) - ২২২৩৬০২৬, ২২২৩৬২৪২

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ - ২২৪১৯০১, ২২৪১৪৯০৪

বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার - ২৪৫৬৭০০১, ২৪৫৬৭০০৫

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২৫৫৫৭৬৭৬, ২৫৫৫৭৬৫৬

এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল - ২২৪৪৩২১২, ২২৪৪৩২১৭

পিয়ারলেস হসপিটাল - ২৪৬২২৩৯৪, ২৪৬২২৪৬২

উডল্যান্ডস - ২৪৫৬৭০৭৯, ২৪৫৬৭০৭৬

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান - ২৪৭৫৩৬৩৬, ২৪৭৫৩৬৩৮

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ১৪ আগস্ট ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।

মায়ের ঘাটে বসে সন্ধে দেখার মজাই আলাদা

এস এ শামীম (ইতিহাসবিদ)

জীবনে কিছু স্মৃতি থাকে যেগুলো চিরঅমলিন। কলকাতার স্মৃতিও আমার কাছে তাই। কলকাতা মানে একটা ফুরফুরে মেজাজ। কলকাতা মানে আমার কাছে সেই দেশভাগের বেদনাদায়ক স্মৃতির ক্ষণিকের সুরাহা। কলকাতা মানে হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা ভালোবাসার টান। বাংলা ভাষার টান।

নানার কাছে দেশভাগের ভয়াবহ স্মৃতির কথা শুনতে শুনতে আমার প্রথম আলাপ কলকাতার সাথে। তারপর ধীরে ধীরে সাহিত্যের টানে সংস্কৃতির টানে ইতিহাসের টানে এই ভিন্ন দেশের শহর কলকাতা কখন আমার মনের এত কাছের হয়ে উঠেছে নিজেই জানতে পারিনি। আমার কলকাতা দেখা বলতে উত্তর কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘোরা, তাদের ছুঁয়ে থাকা পুরোনো ইতিহাসকে স্পর্শ করে দেখা।

আটানব্বই-এর শেষদিকে একবারই গিয়েছিলাম কলকাতায় বন্ধু প্রকাশ চক্রবর্তীর ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর সাক্ষী হতে। ওর বাগবাজারের বাড়িতেই ছিলাম একটা দিন। উত্তর কলকাতার রাস্তা-ঘাট, প্রতিটা অলিতে-গলিতে একটা পুরোনো গন্ধ আছে। আমাদের মতো ইতিহাসের লোকেরা ইতিহাস ছুঁতে, তার অন্তস্তলের আবেশমাখা কাহিনির জন্যই অপেক্ষা করে থাকি। ইতিহাসবিদ প্রকাশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে সেইসব ইতিহাসের দু'চার কলি আমিও জানতে পারলাম, জানতে পারলাম ইংরেজশাসিত কলকাতার অনেক অজানা দিক সম্বন্ধে।

প্রকাশদের বাড়িটা বাগবাজার গঙ্গা থেকে অনতিদূরেই। বাড়ির জানালা দিয়েই দেখা যায় গঙ্গার জলে সূর্যোদয়। দেখা যায় সূর্যাস্ত। রাজা নবকৃষ্ণ দেব থেকে শুরু করে নবীন দাসের রসগোল্লা প্রতিনিয়ত একটা নতুন ইতিহাস আমার সামনে। অদ্ভুত এক নস্টালজিয়ায় কেটেছিল সময়গুলো। গিরিশ ঘোষের বাড়ি, সারদা ঘাট... মানে এটুকু কলকাতা দেখেই আমি মুগ্ধ। হয়তো মুগ্ধতা আরও বেড়ে গিয়েছিল একারণেই যে একজন ইতিহাসবিদ আমাকে চাক্ষুষ দেখা জায়গাগুলোর বর্ণনা দিচ্ছিলেন ঐতিহাসিক পটভূমিকায়।

শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড় থেকে পায়ে হেঁটে গোটা শ্যামবাজার আর বাগবাজার ঘুরেছি আমি, প্রকাশ আর ওর ছোট ভাই রাজীব। বাড়িগুলোর ভেতরেও একটা অদ্ভুত পুরাতনকে বাঁচিয়ে রাখার আকুতি আছে। কোনও বাড়িতে তো পরগাছা জন্মে গেছে। গাছের শিকড়গুলো ফাটল ধরাচ্ছে। একেকটা বাড়ির মাঝখানে স্পেস বলতে প্রায় কিছুই নেই। বহু পুরনো উঁচু উঁচু বাড়ি। প্লাস্টার খসে পড়ছে কোনওটার গা থেকে। যখন প্রকাশ ওর দু-একজন বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল এটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। পুরোনো একটা বনেদিয়ানা

আছে এই বাড়িগুলোর ভেতরে। কড়িকাঠের ছাদ, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকানো স্টাইলের সিঁড়ি ধরে ওঠার হাতল। এই বাড়িগুলোতে ঢুকলেই কেমন যেন একটা ইতিহাসের গন্ধ পাওয়া যায়।

বিকেলে গঙ্গার ঘাটে বসে আছি ফুরফুরে হাওয়ায়। গল্প চলছে ইংরেজদের তৈরি কলকাতা আর এই কলকাতা নিয়ে। সেসব মুহূর্ত আমার জীবনের অন্যরকম প্রাপ্তি। বাজবাজার রেলস্টেশন চলে গেছে গঙ্গার ধার ঘেঁষে এখান দিয়ে। মায়ের ঘাটে বসে সন্ধে দেখার মজাই আলাদা।

যদিও ওই অল্প সময়ে এত বড় শহর কলকাতার কিছুই দেখিনি। শুধু কয়েক বিন্দু কলকাতার স্পর্শেই যে মুগ্ধতা পেয়েছি, তা আজীবন মনের মনিকোঠায় থাকবে। সময় বা সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি, তবে আবারও যেতে হবে আমাকে কলকাতার পরশ মাখতে। ইতিহাসকে অনুভব করতে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট কবি কামিনী রায় (সেন)

স্বস্তিকা নাথ

এটা সেই সময়ের কথা যখন মেয়েদের পড়াশোনা শেখার প্রচলন ছিল না। পড়াশোনা একটি নিন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হতো। সমাজপতিদের ধারণা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই অন্যের সঙ্গে পত্রালাপ করবে। রান্নাঘরে মাটির দেওয়ালে শলাকার সাহায্যে অক্ষর লিখতে শুরু করেছিলেন তিনি। লেখা হয়ে গেলে গোবর জল লেপে সেগুলি পরিষ্কার করে রাখতেন যাতে বয়স্কদের চোখে না পড়ে। শব্দের প্রতি, অক্ষরের প্রতি এই গভীর মমত্ববোধ যাঁর ছিল তিনি আর কেউ নন বাংলা ভাষার এক অবিস্মরণীয় মহিলা কবি কামিনী রায়।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাসণ্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বৈদ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন সেসময়ের বিখ্যাত লেখক ও ব্রাহ্মসমাজের সদস্য চণ্ডীচরণ সেন। পিতামহ নিমচাঁদ সেন ছিলেন ভাবুক ও ধার্মিক প্রকৃতির লোক। শিশু বয়স থেকেই তাঁর পিতামহ তাঁকে বিভিন্ন শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁর ভাবধারায় কামিনী দেবীর শিশুমন যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। বাড়িতে কোন অতিথি এলে তাঁকে

পিতামহের শেখানো শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাতে হতো। শৈশবের এইসব অভ্যাসই তাঁর কাব্যের প্রতি যে অনন্য আকর্ষণ তৈরি করেছিল তাই পরবর্তীকালে অন্য অভিঘাত নিয়ে ধরা দেয় বাংলা সাহিত্যে।

তিনি চার বছর বয়সে লেখাপড়া শুরু করেন। মা যখন রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন শিশু কামিনী তার নিজের হাতে তৈরি মাটির দোয়াতে কালি ভরে খাগের কলম দিয়ে তালপাতার উপর লিখতে বসতেন। স্কুলে আপার প্রাইমারি পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতার কাছে গণিতশাস্ত্র শিখে তিনি এ-বিষয়ে এতদূর পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে গণিত শিক্ষক শ্যামাচরণ বসু তাঁকে 'লীলাবতী' আখ্যা দিয়েছিলেন। চোদ্দো বছর বয়সে কামিনী মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ষোলো বছর বয়সে কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁর দ্বিতীয় ভাষা ছিল বাংলা। এর দু'বছর পর এফএ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং পরে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হবার সম্মান লাভ করেন তিনি।

কামিনী সেন তাঁর পরিবারে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শেই মানুষ হয়েছেন। তাঁর ভগিনী ড. যামিনী সেন লেডি ডাক্তার হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। প্রথমে রাজি না হলেও পরে অন্য অনেকের পরামর্শে কন্যাকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তাঁর পিতা কামিনীকে চাকরি করতে বাধা দেননি এবং ১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন কলেজে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন।

বিবাহের পর ১৯০০ সালে তাঁর এক সন্তানের মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালে ঘোড়ার গাড়ি উলটে গিয়ে তাঁর স্বামী পরলোক গমন করেন। কন্যা লীলা ও পুত্র অশোকের মৃত্যু ১৯২০ সালে। এত শোকের আঘাতে কবি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পুত্র অশোকের মৃত্যুর পর রচিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অশোক সংগীত'। শোকের আঘাত কাটিয়ে ওঠার জন্য তিনি আবার কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশনার সময় নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ— 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯); 'নির্ম্মাল্য' (১৮৯০); 'পৌরাণিকী' (১৮৯১-'৯২ সালে রচিত); 'অম্বা' (নাট্যকাব্য, ১৮৯১-এ রচিত ও ১৯১৫ তে প্রকাশিত); 'গুঞ্জন' (শিশু কবিতা পুস্তক, ১৯০৫); 'ধর্ম্মপুত্র' (অনুবাদ গল্প, ১৯০৭); 'শ্রাদ্ধিকী' (১৯১৩); 'অশোক স্মৃতি' (স্মৃতিকথা, ১৯১৩); 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' (১৯১৩); 'অশোক সঙ্গীত' (১৯১৪); 'সিতিমা' (গদ্য নাটিকা, ১৯১৬); 'ঠাকুরমার চিঠি' (১৯২৩); 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯); 'জীবন পথে' (১৯৩০) ও ড: যামিনী রায়ের জীবনী (জীবনীগ্রন্থ)। কবিতা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের লেখা তিনি লিখলেও মূলত কবি হিসাবেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তার কবিতা 'নব্যভারত', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'বঙ্গলক্ষী' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো।

কামিনী রায়ের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া'। এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে এবং অষ্টম সংস্করণ বের হয় ১৯২৫-এ। গ্রন্থটি যে পাঠক সমাজে আদৃত হয়েছিল, এটা তারই প্রমাণ। এক সময়ে কবির 'সুখ' কবিতাটি লোকের মুখে মুখে ফিরত।

কামিনী রায় তাঁর প্রতিভা ও অবদানের একাধিক স্বীকৃতি পেলেও অনেকে মনে করেন তিনি তাঁর যোগ্য ও প্রাপ্য সম্মান পাননি। বৈদ্যবাটি যুবক সমিতির সভ্যবৃন্দ ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৭ চৈত্র এবং সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখা ১৩৩০-এর ৭ পৌষ কবিকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করে। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্ররাও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কবিকে অভিনন্দন জানান। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯৩২-'৩৩) এবং নারীশ্রমিক তদন্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন (১৯২২-'২৩)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৯ সালে তাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করে সম্মানিত করে।

কামিনী রায়ের কবিতা আশ্বাস ও বিশ্বাসকে জীবনে সজীব রাখতে প্রত্যয়ী। অনাবিল দেশপ্রেম, অবিচল আদর্শবোধ, নীতিজ্ঞান, শোক ও দুঃখকে জয় করার মানসিক দৃঢ়তা, মানবতাবোধ ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, ভাষা ও বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা তাঁর কবিতার মূলমন্ত্র।

যুগশঙ্খ SUPPLI | পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: বিপ্লব রায় | 'কলকাতা' ক্রোড়পত্রটি আপনাদের কেমন লাগছে jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেল করে জানান।